23 OCT 2016
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৫

কালের কণ্ঠ

গোলাম কবির ▷

শিক্ষক নিয়োগে লিখিত পরীক্ষার বিকল্প নেই

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ও ব্যক্তিগত সাহিত্যসচিব অমিয় চন্দ্র চক্রবর্তীকে পত্রে লিখেছিলেন, এসব 'অযোগ্যদের অহংকার' খর্ব করা উচিত (১১.৪.১৯৩৯)। স্বাধীনতা-উত্তরকালে আশির দশকের পর বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা পথে নিয়োগপ্রাপ্ত কিছু শিক্ষক সম্পর্কে কবির এ মন্তব্য বোধকরি স্মরণ করা অন্যায় হবে না। শুধু স্মরণই যথেষ্ট নয়, যারা যোগ্য নয়, তারা যেন কোনোভাবেই জ্ঞানের পবিত্র পাদপীঠকে কলুষিত করতে না পারে, সে ব্যবস্থা নিতে হবে। আমাদের মনে হয়, সরকার এ বিষয়টি কার্যকর করার জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাই।

বর্তমানে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি সমালোচনার ঊর্ধ্বে থাকতে পারছে না। তবে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষক নিয়োগ বিষম ঠেকেছে শিক্ষা সচেতন মানুষের ভাবনায়।

উনিশ শতকে অবিভক্ত বাংলায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গ বাছাই করা শিক্ষিত ব্যক্তিকে শিক্ষকতায় নিয়ে আসতেন। সে ধারা বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত অনুসৃত হতো। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় পণ্ডিতবর ড. শহীদুল্লাহকে তারবার্তা পাঠিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আজকের দিনে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় তদবিরের প্রাধান্য লক্ষণীয়। এ অবস্থা থেকে জাতি মুক্ত হতে না পারলে অদূর ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা বিভীষিকায় পরিণত হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় অভিধাটি উচ্চারিত হলে একদা আমাদের চিত্রপটে একটি জ্ঞানসুন্দর মহিমাময় জগতের পর্দা উন্মোচিত হতো। আজ সে অভিধাটি দেশান্তরিত। এর পেছনে অনেক কারণ থাকলেও শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি সামনে এসেছে। এটা আমাদের জন্য সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্তে আলো দৃশ্যমান হওয়ার মতো।

সন্তানসন্ততি, আত্মীয়স্বজনের প্রতি সস্নেহ দুর্বলতা চিরন্তন, এ ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করলে দৃষ্টিকটু ঠেকে। চাকরির নানা ক্ষেত্রে যাদের ক্ষমতা আছে, তারা তাদের কাছের মানুষকে চাকরিটি পাইয়ে দেয়। বিষয়টি কিঞ্চিৎ সহনীয় হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ পাওয়া কিছু শিক্ষক তুলনামূলকভাবে মেধার বিচারে দুর্বল হলেও কাছের মানুষ হিসেবে নিয়োগ পায়। এটা অপরাধ নয়, পাপ। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রায় প্রতিটি বিভাগে এমনতর ঘটনা ঘটছে। পরস্পরকে সুবিধা ভাগাভাগি করে দেওয়া হয় বলে সংঘাত দৃশ্যমান হয় না। এই সুবিধা দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারে দলমত বাধা হয়ে ওঠে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার জন্য অনার্স কিংবা মাস্টার্সের যেকোনো একটিতে প্রথম শ্রেণিপ্রাপ্তদের প্রাধান্য দেওয়া হতো। প্রথম শ্রেণির অভাব পূরণ করত পিএইচডি। এখন এসএসসি থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত সব পর্যায়ে প্রথম শ্রেণি চাওয়া হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ক্ষমতাধর ব্যক্তি তাদের সম্ভাব্য প্রার্থীকে প্রথম শ্রেণি পাইয়ে দেওয়ার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করে। এ তো গেল ঘরের মধ্যে ঘর তৈরি।

দেখা যাক, বাইরে থেকে প্রার্থীকে কিভাবে যোগ্য করে তোলা হয়। প্রথমে বিজ্ঞান শাখার দিকটা পরখ করে দেখা যাক। অনেক অভিভাবক তাঁদের

শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সংযুক্ত না থাকাই বাঞ্ছনীয়। উন্নত দেশগুলোয় অন্য যেকোনো কর্মক্ষেত্রে প্রার্থীর যে মেধা ও যোগ্যতার প্রয়োজন হয় তার চেয়ে মেধাবীদের বেছে নেওয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার জন্য। তারা সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় সুবিধাপ্রাপ্তির জন্য লেজুড়বৃত্তি করে না। করে না বিত্তবৈভবের তাড়নায় অনৈতিক কাজ

সন্তানকে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার বানানোর জন্য বিজ্ঞান বিষয়ে পড়ান। তারা ওসব বিষয়ে ভর্তি পরীক্ষাও দেয় কিন্তু ব্যর্থ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিষয়ে ভর্তি হতে আসে। কেউ কেউ বিজ্ঞান অনুষদে ভর্তির সুযোগ না পেয়ে বাণিজ্য অথবা সমাজবিজ্ঞান, এমনকি কলা অনুষদে ভর্তি হয়।

'আদাড় গাঁয়ে শেয়াল বাঘ'রূপে প্রথম শ্রেণি পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হওয়ার প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জন করে। অনেক শিক্ষক আছেন শিক্ষাজীবনের কোথাও প্রথম বিভাগ বা শ্রেণি নেই। কোনো কোনো পর্যায়ে তৃতীয় বিভাগও আছে। তারা একটি পিএইচডি করে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হয়ে গেছেন। দলীয় কিংবা আত্মীয়তার সুবাদে এসব অঘটন ঘটেছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে শিক্ষা নামের অভিধাটি আমরা বিস্মৃত হব।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হবেন চৌকস। শুধু নিজ বিষয় সম্পর্কে ধারণা থাকলেই চলবে না, আনুষঙ্গিক বিষয়েও তাঁর জ্ঞান থাকবে। ত্রুটিপূর্ণ নিয়োগব্যবস্থার কারণে অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে, যাদের অনেকে বিসিএস প্রিলিমিনারি পাস করতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় বিশ্বমানের শিক্ষক এখন কতিপয়ে পরিণত হয়েছে।

গত শতকের কুড়ির দশকের আগে পূর্ববাংলায় কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। ১৯২০ সালের পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে ঢাকা, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও ঢাকার ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় মিলে মোট পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। এখন বাংলাদেশে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ৩৮টি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শতাধিক। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা না-ইবা বললাম। এগুলো জাতির কাছে দায়বদ্ধ নয়। কারণ তাদের উদ্দেশ্য ব্যবসা করা। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় জাতির কাছে দায়বদ্ধ। কৃষক-শ্রমিক-জনতার দেওয়া খাজনার টাকায় এগুলো চলে।

সুতরাং এ ক্ষেত্রে জনগণের লাভ-ক্ষতিকে বড় করে দেখতে হবে। আমরা মনে করি, সরকার সেদিকে লক্ষ রেখে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে লিখিত পরীক্ষা প্রবর্তন করতে যাচ্ছে। এটা সবার জন্য স্বস্তির বিষয়। তবে লিখিত পরীক্ষা যেন প্রহসন না হয়।

শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সংযুক্ত না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

উন্নত দেশগুলোয় অন্য যেকোনো কর্মক্ষেত্রে প্রার্থীর যে মেধা ও যোগ্যতার প্রয়োজন হয় তার চেয়ে মেধাবীদের বেছে নেওয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার জন্য। তারা সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় সুবিধাপ্রাপ্তির জন্য লেজুড়বৃত্তি করে না। করে না বিত্তবৈভবের তাড়নায় অনৈতিক কাজ। আমাদের দেশে এ বিষয়গুলো সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে গেছে। যাঁরা শিক্ষক হবেন, তাঁদের বিশ্বাস করা উচিত শিক্ষকতা চাকরি নয়, পেশাও নয়, মিশন। এ মিশনের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলে প্রকৃত শিক্ষক হওয়া যায় না।

লেখক : সাবেক শিক্ষক, রাজশাহী কলেজ